# বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সচিত্র ইতিহাস




বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ

প্রথম প্রকাশ : ১৬ ডিসেম্বর, ২০১০
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৬

বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন

প্রকাশক
বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ
২৩ চামেলীবাগ, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৩ ৩৫৪৩ ফ্যাক্স : ৯৩৪ ০৮৫৬
ই-মেইল : bfdrms@gmail.com
Website : www.bfdr-bd.com

পরিবেশক : শওকত হোসেন লিটু, পারিজাত প্রকাশনী
৬৮-৬৯ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ই-মেইল : parijat1999@gmail.com

গ্রাফিক্স ডিজাইন : সজিব খান

মুদ্রণে : পারিজাত মুদ্রণ শাখা

**মূল্য : ১০০ টাকা মাত্র**

ISBN **978-984-507-275-5**

# বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সচিত্র ইতিহাস

গ্রন্থনা, গবেষণা ও সম্পাদনা

মোনায়েম সরকার

বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন

বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ

## সূ চি প ত্র

# মুক্তিযুদ্ধের উল্লেখযোগ্য তথ্য



করাচি থেকে ঢাকার দূরত্ব ছিল ২৩৬৬ কিলোমিটার

১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশ ব্রিটিশ শাসনের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার পর ভারত এবং পাকিস্তান নামক দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রটি ছিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান নামক দুই অংশে বিভক্ত। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ভাষা বাংলা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষা ছিল পশতু, সিন্ধি, বেলুচি ও পাঞ্জাবি। পাকিস্তানের শাসনভার ছিল প্রধানত পশ্চিম পাকিস্তানের মোহাজের নেতৃবৃন্দের হাতে। এই শাসকেরা পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগণের ওপর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নানা ধরনের নিপীড়ন চালাতে থাকে। একপর্যায়ে তারা সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু করার ঘোষণা দেয়। রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানের কারো মাতৃভাষা উর্দু ছিল না। এটা ছিল ভারত প্রত্যাগত মোহাজেরদের ভাষা। এছাড়া পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানের মোহাজের নেতৃবৃন্দ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। এর প্রতিবাদে পাকিস্তানের পূর্বাংশে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। ক্রমে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ভাষার প্রশ্নে ও অন্যান্য বঞ্চনা এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। এই পটভূমিতে ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৬-দফা ঘোষণা করেন। আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান ঘটে।

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ তাদের ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১৬৭ জন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীকে নির্বাচিত করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আওয়ামী লীগ জাতীয় সংসদে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক আমলাতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠী জাতীয় পরিষদ অধিবেশন আহ্বানের পরিবর্তে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। ১৯৭১-এর ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) লক্ষ লক্ষ মানুষের বিশাল সমাবেশে বলেন– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এরপর সারাদেশ আন্দোলনের জোয়ারে উত্তাল হয়ে ওঠে। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়ার নির্দেশে ঢাকাসহ সাবেক পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলায় পাকিস্তান মিলিটারি নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নির্বিচারে গণহত্যা শুরু করে। তারা অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন ও মানুষের ক্ষতিসাধন করে। সে রাতেই বঙ্গবন্ধু ইপিআর-এর ওয়ারলেসের ডিকোডেড মেসেজের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। তাঁর আহ্বানে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করে পশ্চিম পাকিস্তানি কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। ইপিআর, পুলিশ, আনসার ও বাঙালি সেনারা ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুষ্টিয়াসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করে সশস্ত্র লড়াই শুরু করে। ২৫ মার্চ রাতে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে শেখ মুজিবুর রহমান প্রেরিত নির্দেশকে ভিত্তি করে ২৬ মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথমে আওয়ামী লীগের আবদুল হান্নান কালুরঘাটে স্থাপিত বেতার কেন্দ্রের বেলাল মোহাম্মদ, আবুল কাশেম সন্দীপ এবং ২৭ মার্চ তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন।


তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে ৭ মার্চ '৭১-এর ঐতিহাসিক ভাষণদানরত বঙ্গবন্ধু


বর্বর পাক বাহিনীর হত্যাকাণ্ড

১৯৭১-এর ১০ এপ্রিল তাজউদ্দীন আহমদ গণপরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি (ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি), তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী, খন্দকার মোশতাক আহমদ, এম. মনসুর আলী ও এএইচএম কামারুজ্জামানকে মন্ত্রী করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠন করা হয়। অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল এমএজি ওসমানী এমএনএ-কে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। ঘোষণার এক সপ্তাহের মধ্যে বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী মুজিবনগরে (তৎকালীন মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলার পরিবর্তিত নাম) ১৭ এপ্রিল আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণ শেষে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের সঙ্গে মন্ত্রিসভার সদস্যদেরকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।


মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠান




শিল্পী কামরুল হাসানের আঁকা ইয়াহিয়া খানের কার্টুন




মুজিবনগর সরকারের ফিল্ড পোস্ট অফিস



১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ : নিয়াজি আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছে রেসকোর্স ময়দানে সাথে জেনারেল আরোরা



১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ : নিয়াজি আত্মসমর্পণ কতে যাচ্ছে রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি সৈন্য অস্ত্র সমর্পণ করছে

১৯৭১-এর মে মাসে কলকাতার ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে প্রথম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান দপ্তর স্থাপন করা হয় এবং ৫৭/৮ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে এমএনএ আবদুল মান্নানের পরিচালনায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কার্যক্রম শুরু হয়।

১৯৭১-এর ৭-১২ জুলাই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য দেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের অধিনায়কত্বে যুদ্ধ পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯৭১-এর ১০ আগস্ট সামরিক শাসক ইয়াহিয়া (CMLA) কর্তৃক বিশেষ সামরিক আদালতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রহসনমূলক বিচারের ঘোষণা দেওয়া হয়।

১০ আগস্ট সামরিক আদালতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিচারের প্রহসনের বিরুদ্ধে ভারত ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিশ্বের অন্যান্য স্থানে প্রতিবাদ ও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবি উত্থাপিত হয়। ১৫ আগস্ট চট্টগ্রাম, মংলা ও চাঁদপুর বন্দরে বাংলাদেশের নৌ-কমান্ডোদের গেরিলা আক্রমণে ৯টি পাকিস্তানি জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ১৯৭১-এর ২৩ নভেম্বর মুক্তিবাহিনীর সাফল্যে ভীত হয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানে জরুরি অবস্থা জারি করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনে যেমন–কমলপুর, নকশী, ধলই, জয়মনিরহাট, পটিয়া বাজার, সালদা নদী, বিলোনিয়া, রৌমারী ইত্যাদি এলাকায় মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তান বাহিনীকে ক্রমাগত আক্রমণ ও পর্যুদস্ত করতে থাকে।

পাকিস্তানি সামরিক জান্তার নৃশংস অত্যাচারে অবরুদ্ধ বাংলাদেশ থেকে নভেম্বরের শেষে ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় এক কোটি। মুক্তিযুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গণহত্যা, নারী নির্যাতনসহ অন্যান্য ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড বেড়ে যায়।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সারা পৃথিবীর অনেক দেশ এবং মানুষ সক্রিয় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। সর্বোচ্চ সহায়তা প্রদান করে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত এবং পদগর্নির নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন।

১৯৭১-এর ৩ ডিসেম্বর পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করলে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মধ্যরাতে জাতির উদ্দেশে বেতার ভাষণে আক্রমণ প্রতিহত করার নির্দেশ দেন। বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী যৌথভাবে বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ৬ ডিসেম্বর ভারতীয় পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের ঘোষণা দেন।

১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন ফ্রন্টে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর জয়লাভ অব্যাহত থাকে। যশোর শত্রুমুক্ত হয়। বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ যশোর জনসভায় ভাষণ দেন।

১৪ ডিসেম্বর মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী ঢাকা অবরোধ করে। সেদিন পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তার দোসর আল-বদর ও আল-শামস নৃশংসভাবে অসংখ্য বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করে। ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য আত্মসমর্পণ করে। ১৬ ডিসেম্বর পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন পাকিস্তানের পক্ষে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের প্রধান জেনারেল এ.এ.কে. নিয়াজি এবং যৌথ বাহিনীর পক্ষে লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা। আত্মসর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন উপসেনাপ্রধান তৎকালীন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার।

# মুজিবনগর সরকার

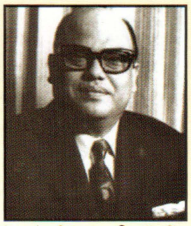
১৯৭১-এর ১০ এপ্রিল তাজউদ্দীন আহমদ স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর (বৈদ্যনাথতলায়) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণ করে। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (Proclamation of Independence) পাঠ করেন অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ আলী এমএনএ (মেম্বার অব ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি)। রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ, অর্থ-বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অব.) এম. মনসুর আলী, স্বরাষ্ট্র, কৃষি-ত্রাণ ও পুনর্বাসনমন্ত্রী এএইচএম কামারুজ্জামান-কে নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। এছাড়া সংবাদপত্র, তথ্য ও বেতার চলচ্চিত্র বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয় এমএনএ আবদুল মান্নানকে।



রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৭১-এর মে মাসে কলকাতার ৮ নং থিয়েটার রোডে মুজিবনগর সরকারের প্রধান দপ্তর স্থাপন করা হয়। ৫৭/৮, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে এমএনএ আবদুল মান্নানের পরিচালনায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কার্যক্রম শুরু হয়। ১২ জুলাই মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জনসংযোগ ও দেশের প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ১১ জন নির্বাচিত সংসদ সদস্যকে আঞ্চলিক প্রশাসক নিযুক্ত করে।

দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল-১ : নূরুল ইসলাম চৌধুরী; দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল-২ : জহুর আহমদ চৌধুরী; পূর্ব অঞ্চল : লে. কর্নেল এমএরব; উত্তর-পূর্ব অঞ্চল-১ : দেওয়ান ফরিদ গাজী; উত্তর-পূর্ব অঞ্চল-২ : সামছুর রহমান খান শাহজাহান; উত্তর অঞ্চল : মতিউর রহমান; পশ্চিম অঞ্চল-১ : মোহাম্মদ আবদুর রহিম; পশ্চিম অঞ্চল-২ : আশরাফুল ইসলাম মিয়া; দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল-১ : আবদুর রউফ চৌধুরী; দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল-২ : ফণীভূষণ মজুমদার; দক্ষিণ অঞ্চল : আবদুর রব সেরনিয়াবাত।



উপরাষ্ট্রপতি ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি
সৈয়দ নজরুল ইসলাম



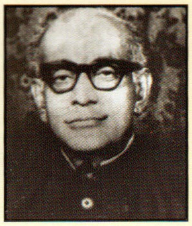
প্রধানমন্ত্রী
তাজউদ্দীন আহমদ

সরকারি প্রশাসন পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিতি সরকারি কর্মকর্তাগণকে সচিব হিসেবে নিয়োগ করা হয়।

রুহুল কুদ্দুস (সেক্রেটারি জেনারেল), হোসেন তওফিক ইমাম (ক্যাবিনেট), নূরুল কাদের খান (সংস্থাপন), মাহবুবুল আলম চাষী/আবুল ফতেহ (পররাষ্ট্র), খন্দকার আসাদুজ্জামান (অর্থ), এম.এ. সামাদ (প্রতিরক্ষা), নূরউদ্দিন আহমদ (কৃষি), এ. খালেক (স্বরাষ্ট্র), আনোয়ারুল হক খান (তথ্য), ডা. টি. হোসেন (স্বাস্থ্য), অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ আলী (সদস্য সচিব ত্রাণ-পুনর্বাসন), এ. হান্নান চৌধুরী (আইন)।



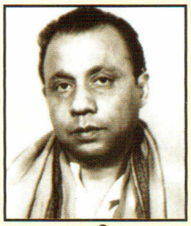
মন্ত্রী
খন্দকার মোশতাক আহমেদ



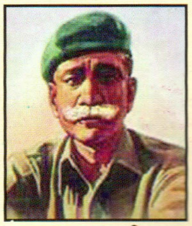
মন্ত্রী
ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী

এছাড়া ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামকে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব, ড. মোজাফফর আহমদ চৌধুরীকে পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান এবং বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে জাতিসংঘে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি দলের নেতা মনোনীত করা হয়।

সেপ্টেম্বর মাসে সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়। এর সদস্য ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (ন্যাপ, ভাসানী), মণি সিংহ (বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি), মনোরঞ্জন ধর (বাংলাদেশ ন্যাশনাল কংগ্রেস), প্রফেসর মুজাফফর আহমেদ (ন্যাপ, মুজাফফর), তাজউদ্দীন আহমদ, বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী, খন্দকার মোশতাক আহমদ, বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের আরও দুজন সদস্য।



মন্ত্রী
এএইচএম কামারুজ্জামান



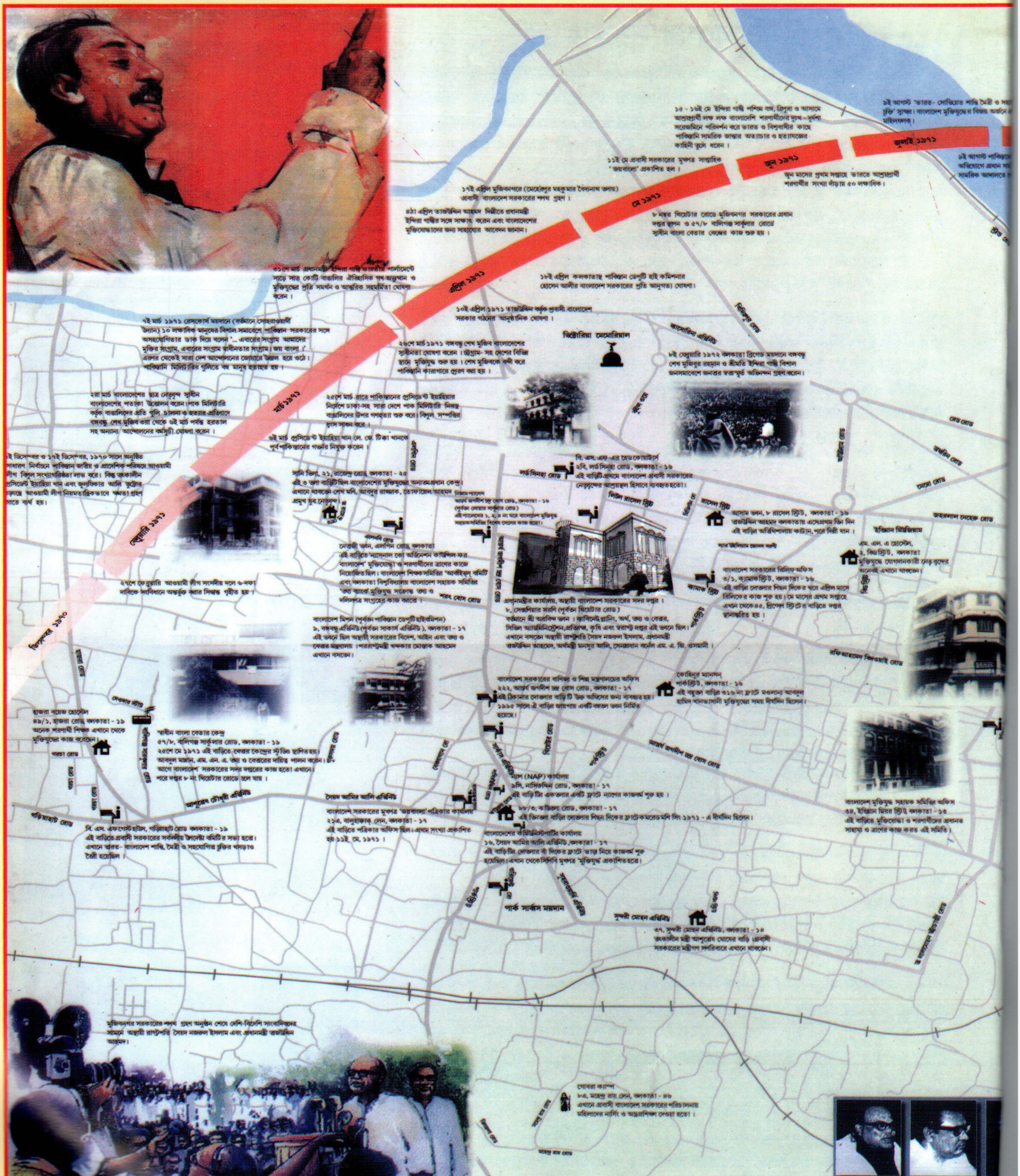
প্রধান সেনাপতি
জেনারেল এমএজি ওসমানী

বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে লন্ডনসহ সমগ্র যুক্তরাজ্যে পাকিস্তান সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে ১ মার্চ থেকে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ২৬ মার্চ থেকে এই আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। এপ্রিল মাস থেকে তিনি বাংলাদেশ সরকারের বিদেশ প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করেন এবং বিশ্ব জনমত বাংলাদেশের পক্ষে নিয়ে আসেন। তিনি বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। দীর্ঘ ৯ মাস মুজিবনগর সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। এ সময় বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন দপ্তর প্রধানত ভারতের কলকাতা শহরের নানা অংশে অবস্থিত ছিল।



মুজিবনগর সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সভা

পরবর্তী পৃষ্ঠার মানচিত্রগুলি প্রথম বাংলাদেশ সরকারের দপ্তরসমূহের অবস্থান, মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধ শিবির এবং শরণার্থী শিবিরের তথ্য ও পরিসংখ্যান সংবলিত।

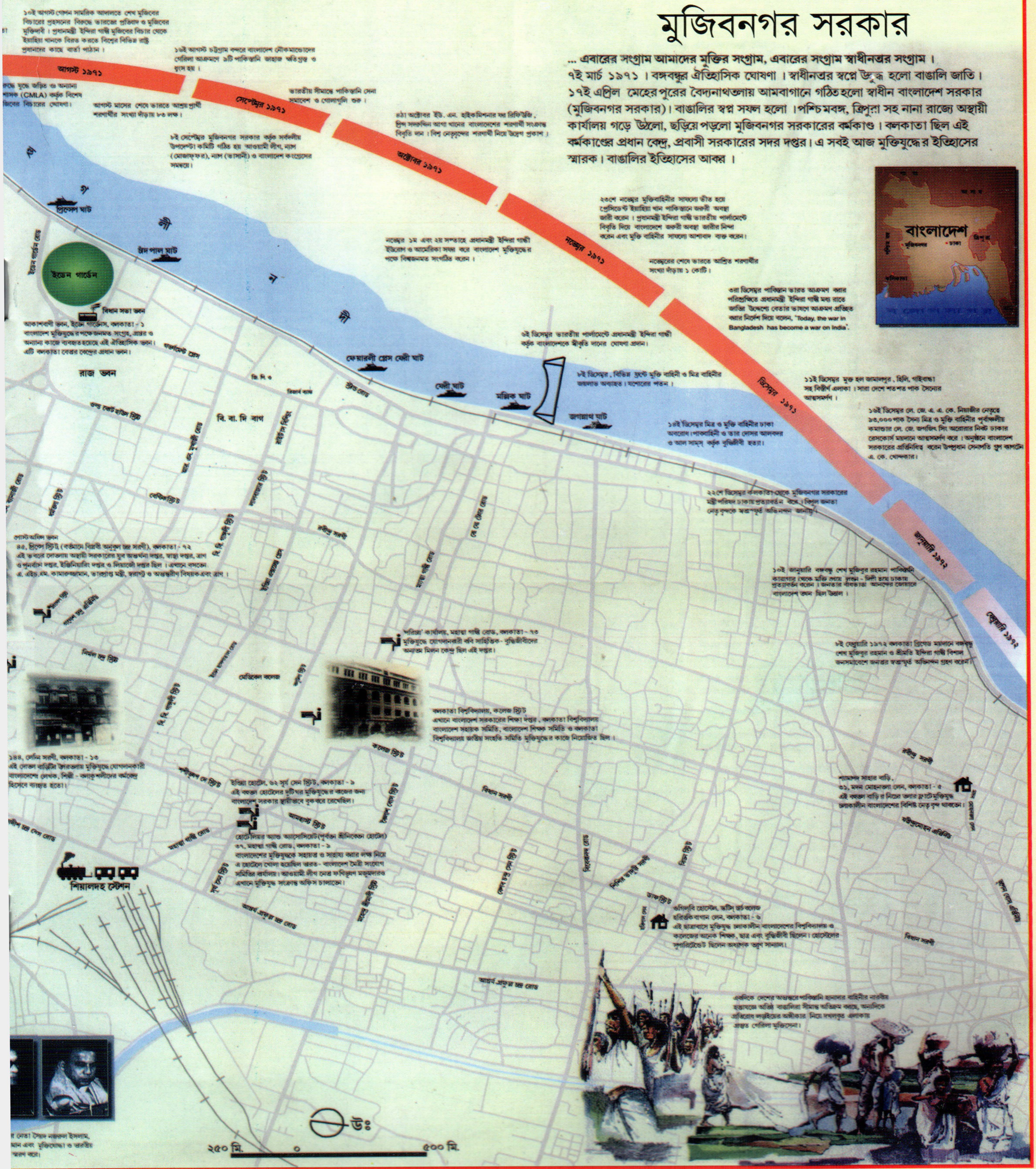


ডিসেম্বর ১৯৭০
ফেব্রুয়ারি ১৯৭১
মার্চ ১৯৭১
এপ্রিল ১৯৭১
মে ১৯৭১
জুন ১৯৭১
জুলাই ১৯৭১
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল
পার্ক সার্কাস ময়দান

# বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

## মুজিবনগর সরকার

... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম । ৭ই মার্চ ১৯৭১ । বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা । স্বাধীনতার স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হলো বাঙালি জাতি । ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় আমবাগানে গঠিত হলো স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর সরকার)। বাঙালির স্বপ্ন সফল হলো ।পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা সহ নানা রাজ্যে অস্থায়ী কার্যালয় গড়ে উঠলো, ছড়িয়ে পড়লো মুজিবনগর সরকারের কর্মকাণ্ড। কলকাতা ছিল এই কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্র, প্রবাসী সরকারের সদর দপ্তর। এ সবই আজ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের স্মারক। বাঙালির ইতিহাসের আকর ।



# মুক্তিযুদ্ধের কতিপয় উল্লেখযোগ্য তথ্য

**১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ তাদের ১৬৯ প্রতিনিধির মধ্যে ১৬৭ জনকেই আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত করে। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী স্বেচ্ছাচার ও বেআইনিভাবে জাতীয় পরিষদ অধিবেশন আহ্বানের পরিবর্তে বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে। উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালে ২৬ মার্চ ঢাকায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের অখ-তা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। স্বাধীনতার ঘোষণা উক্ত তারিখ থেকে কার্যকরী হয়।**

৭মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ১০ লক্ষাধিক জনতার বিশাল সমাবেশে পাকিস্তান সরকারে, সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়ে বলেন, .....'এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।' এরপর থেকেই সারা দেশ আন্দোলনের জোয়ারে উত্তাল হয়ে ওঠে। পাকিস্তানি মিলিটারির গুলিতে অসংখ্যা মানুষ হতাহত হয়।

২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নির্দেশে ঢাকাসহ সারা বাংলায় পাকিস্তান মিলিটারি নিরস্ত্র বাঙালিদের গণহত্যা শুরু করে। অগ্নিসংযোগ ও লুণ্ঠনের মাধ্যমে বিপুল ধন-সম্পদ আত্মসাৎ ও ক্ষতি সাধন করে।

২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। বঙ্গবন্ধুকে বন্দী করে পাকিস্তানি কারাগারে প্রেরণ করা হয়। ইপিআর, পুলিশ, আনসার ও বাঙালি সেনারা ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুষ্টিয়াসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করে সশস্ত্র লড়াইয়ে লিপ্ত হয়।

১০ এপ্রিল ১৯৭১ তাজউদ্দিন আহমদ স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি (ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি), তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী, খন্দকার মুশতাক আহমদ, এম. মনসুর আলী ও এ.এইচ.এম.কামারুজ্জামানকে মন্ত্রী করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীন সরকার গঠন করা হয়। ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল এম.এ.জি. ওসমানী এম এন এ কে-প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়।

১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে (মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলায়) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণ করে। শপথ পরিচালনা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা (Dcclaration of Independence) পাঠ করেন অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ আলী এম এন এ। মে ১৯৭১ কোলকাতার ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে মুজিবনগর সরকারের প্রধান দফতর স্থাপন করা হয় এবং ৫৭/৮ বালিগঞ্জ সারকুলার রোডে এম এন এ আবদুল মান্নানের পরিচালনায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কার্যক্রম শুরু হয়।

৭-১২ জুলাই ১৯৭১ মুক্তিযুদ্ধের সুবিধার্থে দেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে সশস্ত্র বাহিনীর ১১ জন কর্মকর্তার অধিনায়কত্বে যুদ্ধ পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সশস্ত্র বাহিনীর সদর দফতর স্থাপন করা হয়। মুজিবনগরে। ১নং সেক্টর– মেজর জিয়াউর রহমান/মেজর রফিকুল ইসলাম, ২নং সেক্টর– মেজর খালেদ মোশারফ/মেজর এ. টি. এম. হায়দার, ৩নং সেক্টর– মেজর কে.এম. শফিউল্লাহ/মেজর এ. এন. এম. নূরুজ্জামান, ৪নং সেক্টর– মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত, ৫নং সেক্টর– মীর শওকত আলী, ৬নং সেক্টর– উইং কমান্ডার এম. কে. বাশার, ৭নং সেক্টর– মেজর নাজমুল হক/লে. কর্নেল (অব) কাজী নূরুজ্জামান, ৮নং সেক্টর– মেজর আবু ওসমান চৌধুরী/মেজর এম. আবুল মঞ্জুর, ৯নং সেক্টর মেজর এম. এ জলিল, ১০নং সেক্টর– কর্নেল এম.এ.জি. ওসমানীর নেতৃত্বে বিশেষ সেক্টর, ১১নং সেক্টর মেজর আবু তাহের/স্কোয়াড্রন লিডার এম. হামিদুল্লাহ খান।

১২ জুলাই মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জনসংযোগ ও দেশের প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে মুজিবনগর সরকার ১১ জন নির্বাচিত সংসদ সদস্যকে আঞ্চলিক প্রশাসক নিযুক্ত করে। দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল-১: নূরুল ইসলাম চৌধুরী, দক্ষিণ-পূর্ব-অঞ্চল-২: জহুর আহমদ চৌধুরী, পূর্ব অঞ্চল: কর্নেল এম.এ. রব, উত্তর-পূর্ব অঞ্চল: ১ দেওয়ান ফরিদ গাজী, উত্তর-পূর্ব-২ : সামছুর রহমান খান শাহজাহান, উত্তর অঞ্চল: মতিউর রহমান, পশ্চিম অঞ্চল-১: মোহাম্মদ আবদুর রহিম, পশ্চিম অঞ্চল-২: আশারাফুল ইসলাম মিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিম-১: আবদুর রউফ চৌধুরী, দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল-২: ফণীভূষণ মজুমদার, দক্ষিণ অঞ্চল: আবদুর রব সেরনিয়াবাত। সরকারী প্রশাসন পরিচালনার জন নিম্নলিখিত সরকারি কর্তকর্তাগণকে সচিব হিসেবে নিয়োগ করা হয়। রুহুল কুদ্দুস (সেক্রেটারি জেনারেল), হোসেন তওফিক ইমাম (ক্যাবিনেট), নূরুল কাদের খান (সংস্থাপন), মাহবুবুল আলম চাষী/আবুল ফতেহ (পররাষ্ট্র), খন্দকার আসাদুজ্জামান (অর্থ), এম, এ, সামাদ (প্রতিরক্ষা), নূরুউদ্দিন আহমদ (কৃষি), এ. খালেক (স্বরাষ্ট্র), আনোয়ারুল হক খান (তথ্য), ডা. টি. হোসেন (স্বাস্থ্য) অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ আলী (সদস্য-সচিব, ত্রাণ-পুনর্বাসন), এ. হান্নান চৌধুরী (আইন)

ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম: প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব। ড. মোজাফফর আহমদ চৌধুরী: পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী: জাতিসংঘে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি দলের নেতা।

দেশে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনার লক্ষ্যে ৪ জন যুব নেতার যৌত নেতৃত্বে বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স (BLF) নামে একটি পৃথব বাহিনী গড়ে তোলা হয়। পরবর্তী কালে এই বাহিনী মুজিব বাহিনী নামে অভিহিত হয়। সমন্বয়কারী হিসেবে ছিলেন পূর্ব অঞ্চলে শেখ ফজলুল হক মনি, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে সিরাজুল আলম খান, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে আবদুর রাজ্জাক, পশ্চিম-দক্ষিণ অঞ্চলে তোফায়েল আহমদ। BLF বাহিনী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিলো উত্তর ভারতের দেরাদুন ও আসামের হাফলং-এ

অবরুদ্ধ বাংলাদেশে টাঙ্গাইল জেলার কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে সংগঠিত একটি গেরিলা বাহিনী সক্রিয় ছিলো। এ ছাড়া অবরুদ্ধ ঢাকায় ক্রাক পস্ন্যাটুনসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কতিপয় গেরিলা বাহিনী তৎপর ছিলো।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে গোবরা ক্যাম্পে বেগম সাজেদা চৌধুরীর পরিচালনায় মহিলা মুক্তিযোদ্ধাদের নার্সিং ও অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো।

৯ আগষ্ট ১৯৭১ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িত অন্যান্য অভিযোগ প্রধান সামরিক শাসক (CMLA) কর্তৃক বিশেষ সামরিক আদালতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারের ঘোষণা করা হয়।

মোহাম্মদ ফরহাদের নেতৃত্বে ন্যাপ, কমিউনিষ্ট পার্টি ও ছাত্রইউনিয়নের একটি গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলা হয়।

১০ আগষ্ট সামরিক আদালতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিচারের প্রহসনের বিরুদ্ধে ভারতের প্রতিবাদ ও বঙ্গবন্ধু মুক্তি দাবি। মুজিবের বিচার থেকে ইয়াহিয়া খানকে বিরত করতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট বার্তা প্রেরণ করেন।

১৫ আগষ্ট চট্টগ্রাম, মংলা ও চাঁদপুর বন্দরে বাংলাদেশের নৌ-কমান্ডোদের গেরিলা আক্রমণে ৯টি পাকিস্তানি জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস করা হয়।

২৩ নভেম্বর ১৯৭১ মুক্তিবাহিনীর সাফল্যে ভীত হয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানে জরুরী অবস্থা জারী করেন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় পার্লামেন্টে বিবৃতি দিয়ে জরুরী অবস্থা জারির নিন্দা করেন এবং মুক্তিবাহিনীর সাফল্যে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

পাকিস্তানি সামরিক জান্তার নৃশংস অত্যাচারে অবরুদ্ধ বাংলাদেশ থেকে নভেম্বরের শেষে ভারতে আশ্রিত শরণার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১ কোটি। মুক্তিযুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গণহত্যা, নারী নির্যাতনসহ অন্যান্য ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড বেড়ে যায়।

৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করলে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মধ্যরাতে জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণে আক্রমণ প্রতিহত করার নির্দেশ দেন। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনী একযোগে বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

৬ ডিসেম্বর ভারতীয় পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের ঘোষণা দেন।

৭ ডিসেম্বর বিভিন্ন ফ্রন্টে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর জয়লাভ অব্যাহত থাকে। যশোহর শত্রুমুক্ত হয়। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ যশোহর জনসভায় ভাষণ দেন।

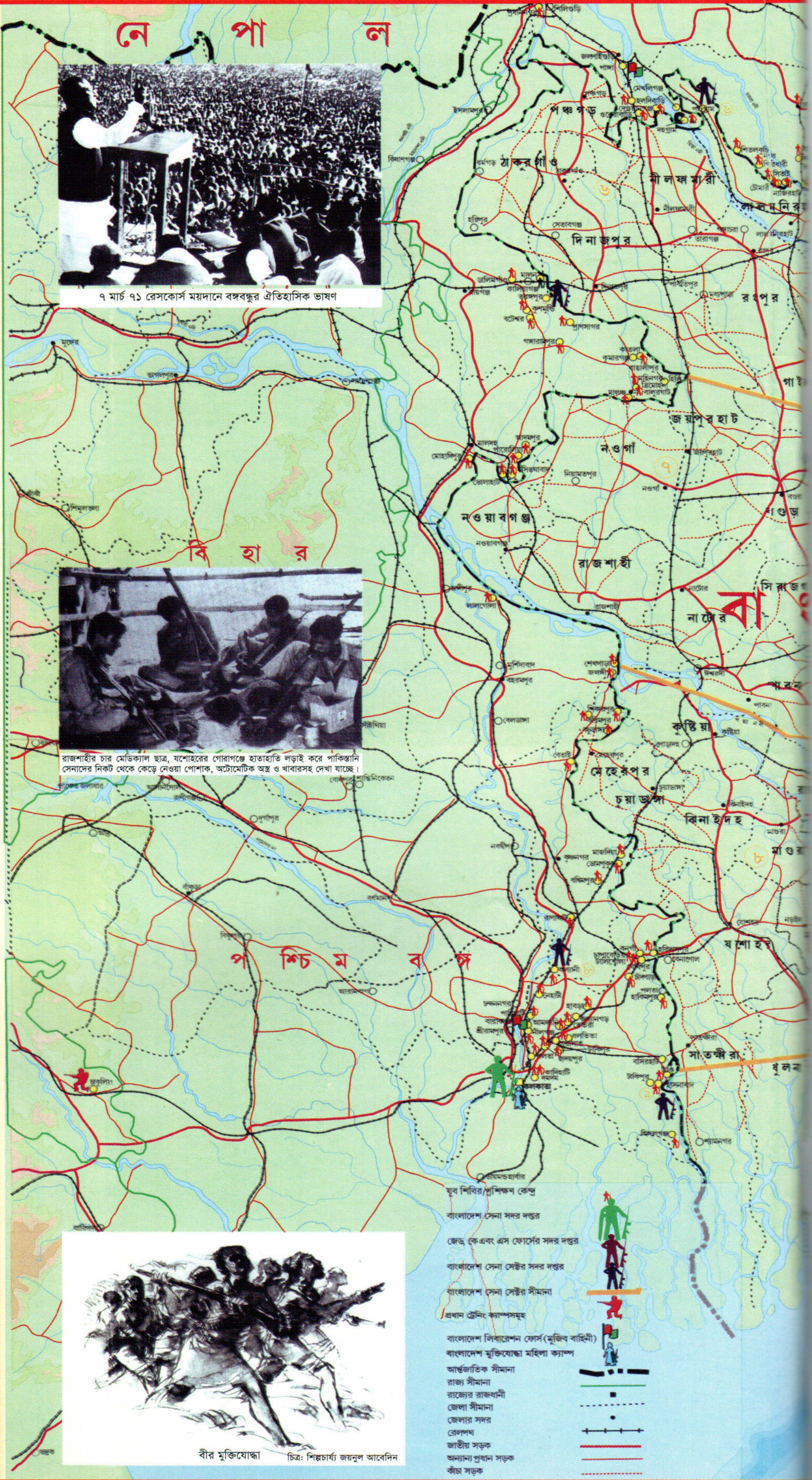
১৪ ডিসেম্বর মিত্র ও মুক্তিবাহিনী ঢাকা অবরোধ করে। পাকবাহিনী ও তা দোসর আলবদর ও আলশামস্ নৃশংসভাবে অসংখ্যা বুদ্ধিজীবী হত্যা করে।

১৬ ডিসেম্বর ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ করে। আত্মসমর্পণ দলিলে লে. জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজী এবং মুক্তিবাহিনীর ও মিত্রবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা স্বাক্ষর করেন। আত্মসমর্পণ আনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন উপসেনাপ্রধান গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার।

২২ ডিসেম্বর মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রীপরিষদ ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করে। বিপুল জনতা নেতৃবৃন্দকে [illegible] অভিনন্দন জানায়।

১০ জানুয়ারি ১৯৭২ বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান কারাগার থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। [illegible] এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়। রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেন।

বঙ্গবন্ধুর [illegible] যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে লন্ডনসহ সমগ্র যুক্তরাজ্যে পাকিস্তান সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে ১ মার্চ থেকে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ২৬ মার্চ থেকে এই আন্দোলনের [illegible] সম্পৃক্ত হন। এপ্রিল মাস থেকে তিনি বাংলাদেশ সরকারের বিদেশ প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করেন এবং বিশ্ব জনমত বাংলাদেশের পক্ষে নিয়ে আসেন। তিনি বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের মিশন প্রতিষ্ঠা করেন।




৭ মার্চ ৭১ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ

রাজশাহীর চার মেডিক্যাল ছাত্র, যশোহরের গোরাগঞ্জে হাতাহাতি লড়াই করে পাকিস্তানি সেনাদের নিকট থেকে কেড়ে নেওয়া পোশাক, অটোমেটিক অস্ত্র ও খাবারসহ দেখা যাচ্ছে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা — চিত্র: শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন

# বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

## মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধ শিবির



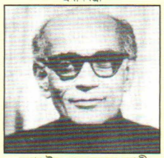

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ : রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি সৈন্য অস্ত্র সমর্পণ করছে


রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান


সৈয়দ নজরুল ইসলাম
উপরাষ্ট্রপতি ও ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি

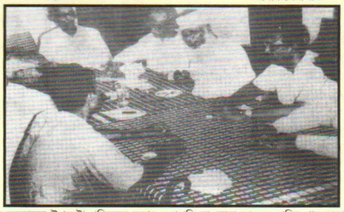

তাজউদ্দিন আহমদ
প্রধানমন্ত্রী


খন্দকার মোশতাক আহমেদ
মন্ত্রী

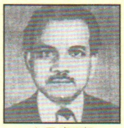

ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী
মন্ত্রী


এ এইচ এম কামারুজ্জামান
মন্ত্রী


জেঃ এম এ জি ওসমানী
প্রধান সেনাপতি


মুজিবনগর সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সভায় সভাপতি মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, সদস্য কমরেড মনি সিংহ, অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ, শ্রী মনোরঞ্জন ধর, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ, মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ, মন্ত্রী এম মনসুর আলী ও মন্ত্রী এ এইচ এম কামারুজ্জামান।

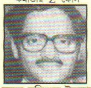

এস এ রব
চীফ অব জেনারেল স্টাফ


এ কে খন্দকার
উপসেনা প্রধান ও বিমান বাহিনী প্রধান


লেঃ কর্নেল জিয়াউর রহমান
কমান্ডার 'Z' ফোর্স


লেঃ কর্নেল কে এম শফিউল্লাহ
কমান্ডার 'S' ফোর্স


লেঃ কর্নেল খালেদ মোশাররফ
কমান্ডার 'K' ফোর্স


মেজর রফিকুল ইসলাম
কমান্ডার, সেক্টর নং-১


মেজর এ এন এম নুরুজ্জামান
কমান্ডার, সেক্টর নং-৩


মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত
কমান্ডার, সেক্টর নং-৪


মেজর মীর শওকত আলী
কমান্ডার, সেক্টর নং-৫


উইং কমান্ডার এম কে বাশার
কমান্ডার, সেক্টর নং-৬


মেজর কাজী নুরুজ্জামান
কমান্ডার, সেক্টর নং-৭


মেজর আবু ওসমান চৌধুরী
কমান্ডার, সেক্টর নং-৮


মেজর এম এ মঞ্জুর
কমান্ডার, সেক্টর নং-৮


মেজর এম এ জলিল
কমান্ডার, সেক্টর নং-৯


মেজর আবু তাহের
কমান্ডার, সেক্টর নং-১১


শেখ ফজলুল হক মনি
সংগঠক মুজিব বাহিনী পূর্ব অঞ্চল


সিরাজুল ইসলাম খান
সংগঠক মুজিব বাহিনী উত্তর অঞ্চল


আবদুর রাজ্জাক
সংগঠক মুজিব বাহিনী উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল


তোফায়েল আহমেদ
সংগঠক মুজিব বাহিনী পশ্চিম-দক্ষিণ অঞ্চল

# বাঙালি শরণার্থী শিবির
## রাজ্য ও জেলাভিত্তিক অবস্থান
### (১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত)

**রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ**

**জেলা ২৪ পরগনা:**
হাসনাবাদ, বসিরহাট, টাকী, স্বরূপনগর, বাদুরিয়া, গোবরডাঙ্গা, মসলন্দপুর, কালপুর, মেদিয়া, ইছাপুর, সুনতিয়া, বাণীপুর, পায়রাগাছি, লক্ষীপুর, সাধনপুর, সাহারা, বারাকপুর, দিগবেড়িয়া, দত্তপুকুর, কানাপুকুর, বারাসাত, মামাভাগিনা মারিঘাটা, বাগদা, হেলেঞ্চা, গাংরাপোতা, সল্টলেক, নীলগঞ্জ, নববারাকপুর, দোগাছিয়া।

**জেলা নদীয়া:**
করিমপুর, পলাশিপাড়া, বেতাই, নাজিরপুর, বানপুর, চাপড়া, ডোমপুকুরিয়া, পুরানগঞ্জ, জাভা, ভালুকা, ভাদুরপুর, মুরাগাছা, দণিপাড়া, কল্যাণী, শিকারপুর, মাজদিয়া, ভাজনঘাট, আসাননগর, বাদকুলা উলশি, রাণাঘাট, শান্তিপুর।

**জেলা মুর্শিদাবাদ:**
দৌলতাবাদ, কলাডাঙ্গা, বাড়ুইপাড়া, চোয়া, হরিহরপাড়া, করিমনগর, নিশ্চিন্তপুর, রুকনপুর, শাহাজাদপুর, আমতলা, ঝাউবোনা, মধুপুর, নওদা, পাটিকাবাড়ি, মাগনপাড়া, ভগীরথপুর, ভাতশালা, ডোমকল, কাটাকোবরা, সাদীখানদিয়া, সাহেবরামপুর, চোয়াপাড়া, হুকাপাড়া, জলঙ্গী, কাজীপাড়া, নাতিয়াল, সাগরপাড়া, সাহেবনগর, লালবাগ, জিয়াগঞ্জ, দাড়াপনগর, দিলফরবাদ, নসিপুর, কুর্মিতলা, আজিমগঞ্জ, দেবীপুর, লালগোলা, রানীনগর, নবীপুর, কাতলামারি, রাখালদাসপুর, শেখপাড়া, রামবাগ, হাবাসপুর, বাগডাঙ্গা, পাটামারি, আখেরীগঞ্জ, খাড়িবোনা, ভগবানগোলা, কালুখানি, আসানপুর, দারারকান্দি, ভূরকুণ্ডা, সাহাপুর, মনিগ্রাম।

**জেলা মালদহ:**
বামনগোলা, পাকুরিয়া, মহেশপুর, গওলটজ, পালট্রানজিট, পাকশাঘাটা, গাজল, দোহিল, হাতিমারি, কুতুব শাহর, আদিনা, কাঁচুয়াডাঙ্গা, একলাখি, রাহুতারা মিশন, কেন্দপুকুর, বুলবুলচন্ডি, ঋষিপুর, সিংহাবাদ, আইহো, হরিশচন্দ্রপুর, বিশাপুর, কুশিদহ, তুলশিহাটা, মশালদহ, ব্রিনজল, বড়ই, কেনুয়া, চন্ডিপুর, গোপালগঞ্জ, কালিয়াচর, মোখাবাড়ি, বৈষ্ণবনগর, পাগলা ব্রীজ, বঙ্গটোলা, গয়েশবাড়ি, সুজাপুর, গোবিন্দপাড়া, মালতিপুর, খরবা, কালিগ্রাম, আশাপুর, পাহাড়পুর, নলাহাট, মহাদিপুর, ডিইবি ডাকবাংলো, নঘড়িয়া, রাইগ্রাম, মিলকি, কালিন্দ্রি, মথুরাপুর, নাজিরপুর, বেচুতলা, মানিকচকদিয়ারা, আড়াইভাঙ্গা, একবর্ণ, হরিপুর, পরানপুর, রতুয়া, দেবীপুর, সামসি, বাহারল, ভালুকা, বাহাদো, ভগবানপুর, খাঁপুর।

**জেলা পশ্চিম দিনাজপুর:**
কালদীঘি, গঙ্গারামপুর, নয়াবাজার, শিববাড়ী, চালুন, সর্বমঙ্গলা, সুখদেবপুর, ভেঙ্গাপোড়া, নেহামবা, বুলবারি, জাহাঙ্গীরপুর, রতনপুর, তপন, দরালহাট, রামপুর, চকবালি গ্রাম, করদহ, ভাওর, তিলম, লঙ্গারহাট, পতিরাম, নাজিরপুর, বরকলি, অমুতখণ্ড, মালঞ্চ, খাদিমপুর, চককাসি, নন্দিপুর, চিঙ্গিশপুর, বেলতলা, খাসপুর, হিলি, ত্রিমোহণী, মুরলিপুর, পানজুল, ধলপাড়া, দশপাড়া, লক্ষ্মীপুর, চোপড়া, পাটাগোরা, মতিকুন্ড, ঠাকুরবাড়ি, রামগঞ্জ, গোয়ালপোখর, দড়িবীর, রাসাখোয়া, আতিয়াখোরি, সুজলি, ফকিরগঞ্জ, জয়দেবপুর, সাফানগর, কুমারগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, রাধানগর, বতুন, ধর্মপুর, মালন, নওদা, ডালিমগাঁও, মহারাজাহাট, রামপুর, বংশীহারি।

**জেলা দার্জিলিং:**
কান্তিভিলা।

**জেলা জলপাইগুড়ি:**
সন্যাসীকাটা, আমইদীঘি, জাতিয়াকালি, মনুয়াগাছ, সাকাটি, বেরুবাড়ি, পাটকাটা, দ্রঙ্গী, পানিযেহাটি, রংধামালি, গুমিরাপাড়া, মানিকগঞ্জ, সরাউলা শিবির, পলিটেকনিক, বলরামপুরহাটা, পানবিড়ি, বন্ধুনগর, জলপেশ, দেবগ্রাম, ডানকিমারি, হলদিবাড়ী, দেওয়ানগঞ্জ, ডুয়ার্স, বশিলাগঙ্গা, বাগজান, ডাঙ্গি, লক্ষ্মীকান্ত, রাঙাটি, অগ্রভাষার, মতিয়ালি, বড়দীঘি।

**জেলা কোচবিহার:**
দেওয়ানহাট রেলস্টেশন, মক্কাটিপুন্নাবঙ্গা, ধুনপুর, নটুয়ারপাড়, রাজারহাট, মধুপুর, পুন্ডিবাড়ি, পটলাখাওয়া, করলিরডাঙ্গা, দীনেশ্বরী, খরিজকাকরিবাড়ি, দেওয়ানগঞ্জ, হুয়ারেরডাঙ্গা, হলদিবাড়ি, চ্যাংড়াবান্দা, জামালদহ, রানীরহাট, ধাপড়াহাট, ডাঙ্গেরবাট, জলধোয়া, জোরাই, বক্সীরহাট, দেওছড়াই, বলরামপুর, বালাভূট, ঝাউকুটি, পাগলারহাট, রথেরডাঙ্গা, নগরলালবাজার, বড়মরিচা, গোসাইরহাট, ডাকালিরহাট, ডাকঘরা, খলিশামারি, ছোটশালবাড়ি, বারোনিডাঙ্গা, করজিরদীঘি, রানীরদীঘি, ঘোড়রারডাঙ্গা, কৃষ্ণকলোনী, বসন্তবাবুডাঙ্গা, সুয়ানঘাট, নাকাটি, চানঘাট, কালিগঞ্জেরডাঙ্গা, বাঘমারারদীঘি, বামনডাঙ্গা, গোলেনহাতি, দেওয়ানকোটজয়দুয়ার, জটামারি, টলালবাজার, বড়মশিয়া, ভোগরামপুর, আশোকবাড়ি, আঙ্গকাটাপরদরি, পটকামারি, ঘোকসারডাঙ্গা, বুড়িহাট, খলিশাগোসাইমারি, কালিগঞ্জ, বাসন্তিরহাট, বেন্তাগুড়ি, কিসামতদা সাভাম, বড়ডাঙ্গা, নিগমনগর, খরখরিয়া, বলিকা, পুটিমারি, চড়াবাড়ি, পেতলা, রাসমাড়ির মঠ, বর্ণচিনা, ছোটফলিমারি, জমাদারের বস, সিতাই, কায়েতেরবাড়ি, চামলা, আদাবাড়ি, বালাহকুরি, ব্রক্ষতারো হাটরা, বিজলিছটকা।

**রাজ্য মেঘালয়:**

**জেলা গারো হিল্স:**
বাগমারা, ডালু, চান্দভূই, চিচেঙ্গাপাড়া হাট, হালজতিহাট, মাচাংপানি, আমপাটি, চেবেনং, ময়নং, শিববাড়ি, বিনা, পোরাকাসুয়া হাট, কলাইপাড়া ডোমাপাড়া।

**জেলা খাসি এবং জয়ন্তিকা হিল্স:**
পংটু, মদন লাইনট, মদন বাইতা, সউলং, আমত্রং, দিয়েনগিরি, আমলারেম, আমসোমালেং, দালোট, লালপানি, মাওয়াছোরা, পাঁচারিং, মুনাই, সিনডাই, শেলা, ইছামতি, মাইলেম, ওয়ারেংকা।

**রাজ্য আসাম:**

**জেলা কাছাড়:**
চন্দ্রনাথপুর, চারগোলা, দাশগ্রাম, হিরেনচেরা, কাঠাল, লক্ষীনগর, শিলকুরি, সোনারিয়া।

**জেলা গোয়ালপাড়া:**
বড়কোণা, ফকিরগ্রাম, মানকাচর, নিদানপুর, সরফানগুড়ি।

**জেলা মিজো হিল্স:**
হাকলং

**জেলা নওগাঁ:**
হোজাই, নীল বাগান, সিদাবাড়ি।

**রাজ্য ত্রিপুরা:**
আমবাসা, কমলপুর, কুমারঘাট, ৮৫ মাইল, পদ্মবিল, শ্রীনাথপুর, উপতাখালি।

**জেলা দক্ষিণ ত্রিপুরা:**
বগাটি, চন্দ্রপুর, মজলিশপুর, হরিনা, ঋষিমুখ, কাকড়াবন, কলাচড়া কাওয়ামারা, মইচরা, কুলকুমারি, রাজনগর, শ্রীনগর।

**জেলা পশ্চিম ত্রিপুরা:**
আমতলি, বড়জলা, ব্রজপুর, মেকুরিয়া, কমলপুর, গান্ধীগ্রাম, হাপানিয়া, ঈশানপুর, খোয়াই, মধুপুর, মতিনগর, মেলাঘর, মোহনপুর, সিমনা, তেলিয়ামোরা।






# বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

## গণহত্যা ও শরণার্থী পরিসংখ্যান

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর ষড়যন্ত্রে নিয়মতান্ত্রিক পথে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের নেতা শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের হাতে পাকিস্তানের ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ২৫ শে মার্চ ১৯৭১ গভীর রাতে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা ঢাকাসহ সারা পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের উপর গণহত্যা শুরু করে।

২৬ শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সারা দেশে মুক্তিযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। পাক সেনার অত্যাচারে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষ শহর ছেড়ে গ্রামে, গ্রাম ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে সীমানা পেরিয়ে ভারতের মাটিতে আশ্রয় নিতে শুরু করে।

৩১শে মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশে ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন ও সহমর্মিতা ঘোষণা করেন।

১৭ই এপ্রিল মুজিবনগরে (তৎকালীন মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলা গ্রামে) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দিন আহমদ প্রধানমন্ত্রী, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমদ ও এ এইচ এম কামরুজ্জামান মন্ত্রী পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ দুর্গত বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আবেদন জানান। কলকাতার মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী সদর দপ্তর স্থাপিত হয়। ১৫-১৬ই মে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসাম রাজ্যে আশ্রয়প্রার্থী লক্ষ লক্ষ বাঙালি শরণার্থীদের দুঃখ-দুর্দশা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। ভারতে ও বিশ্ববাসীর কাছে নিরপরাধ মানুষের উপর পাকিস্তানি সামরিক জান্তার হত্যাযজ্ঞ তুলে ধরেন। ২৪শে মে ১৯৭১ ভারতীয় লোকসভায় বাংলাদেশের পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'এত অল্প সময়ে এই বিপুল জনসংখ্যার দেশত্যাগ (Migration) ইতিহাসে নজিরবিহীন। গত ৮ সপ্তাহে প্রায় ৩৫ লক্ষ মানুষ বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। এই জনসমষ্টির মধ্যে রয়েছে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান; প্রতিটি ধর্মের বিভিন্ন সামাজিক স্তর ও নানা বয়সের মানুষ। প্রচলিত অর্থে এদের 'উদ্বাস্তু' বলা চলে না, যদিও দেশভাগের সময় থেকেই আমরা এই উদ্বাস্তু কথাটির সাথে পরিচিত। প্রকৃত অর্থে এরা হলেন যুদ্ধের শিকার, যারা সামরিক সন্ত্রাস থেকে মুক্তি পেতে সীমানা পেরিয়ে আমাদের দেশে আশ্রয় নিয়েছে।

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহেই ভারতে আশ্রয়প্রাপ্ত শরণার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০ লক্ষাধিক। ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়া মহাদেশের অনেক দেশ বিশেষ করে রাশিয়া ও ভারতবর্ষ বাংলাদেশ সীমান্তের ওপারে আশ্রয়প্রাপ্ত বিশাল সংখ্যক শরণার্থীদের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে। ২৮শে জুলাই 'ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটি ইমার্জেন্সি মিশনের (ভারতে আশ্রয়প্রাপ্ত বাংলাদেশ শরণার্থী সংক্রান্ত) চেয়ারম্যান মি. এনজিয়ার বিড্‌ল ডিউক মার্কিন সরকারের নিকট প্রদত্ত তাঁর রিপোর্টের এক অংশে উল্লেখ করেন: যদিও পাক সেনাবাহিনী হাজার হাজার বাঙালি মুসলমানকে নির্বিচারে হত্যা করেছে, তথাপি হিন্দু জনসাধারণই ছিলো এই আক্রমণের মূল লক্ষ্য। হিন্দু, ভারত ও তাদের দালালরাই পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য দায়ী বলে সামরিক জান্তা মনে করে। যে সকল মুসলমান হিন্দুদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন পাক সেনাবাহিনী তাদের একাংশকেও বাধ্য করেছিলো হিন্দুদের বাড়িঘর ও সম্পত্তি পোড়ানো ও লুঠ করতে, এ কাজ না করলে তাদেরও হত্যা করার হুমকি দিয়েছিলো।

১৩ই আগস্ট মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সফর করেন এবং শরণার্থী জনগণের দুর্দশা দেখে বলেন, 'It is a greatest human tragedy of our time.'

আগস্ট মাসের শেষে আশ্রয়প্রাপ্ত শরণার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৩ লক্ষ।

৪ঠা অক্টোবর শরণার্থী সংক্রান্ত জাতিসংঘের হাইকমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খান বাংলাদেশ শরণার্থী সম্পর্কে বিবৃতি দেন। বিশ্ব নেতৃবৃন্দ শরণার্থী নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

পাকিস্তানি সামরিক জান্তার নৃশংস অত্যাচারে অবরুদ্ধ বাংলাদেশ থেকে নভেম্বর মাসের শেষে ভারতে আশ্রিত শরণার্থী সংখ্যা দাঁড়ায় ১ কোটির উপরে।

৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণে আক্রমমণ প্রতিহত করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, "Today the war in Bangladesh has become the war on India." বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী ও ভারতের মিত্রবাহিনী একযোগে বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করতে সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

৬ই ডিসেম্বর ভারতীয় পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশকে 'স্বাধীন সার্বভৌম দেশ' হিসাবে স্বীকৃতি দানের ঘোষণা দেন।

১৬ই ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে চারটায় ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের যে স্থানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার আহ্বান জানিয়েছিলেন, সেই স্থানে হর্ষোৎফুল। বিশাল জনতার উপস্থিতিতে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বাহিনীর নিকট পাকিস্তান বাহিনীর সমর নায়ক লেঃ জেনারেল নিয়াজি ৯৩ হাজার সৈন্য ও অফিসারসহ আত্মসমর্পণ করেন। এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন বাংলাদেশ সরকারের উপপ্রধান সেনাপতি বিমানবাহিনী প্রধান গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার। আত্মসমর্পণ দলিলে ভারত-বাংলাদেশ যুগ্ম কমান্ডের অধিনায়ক লে. জে. জগজিৎ সিং অরোরা এবং পাকিস্তান বাহিনীর পক্ষে জেনারেল এ. কে. নিয়াজি স্বাক্ষর করেন।

৩০ লক্ষ শহীদের আত্মবলিদানে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়। শরণার্থীগণও স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে ফিরতে শুরু করেন।

২২ শে ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ কোলকাতা থেকে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন।

## ভারতের রাজ্যগুলিতে শরণার্থীর পরিসংখ্যান

| ক্রমিক নং | রাজ্যের নাম | শিবির সংখ্যা | ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১ পর্যন্ত শরণার্থী সংখ্যা | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | শিবিরের মধ্যে | শিবিরের বাইরে | মোট |
| ১ | পশ্চিমবঙ্গ | ৪৯২ | ৪,৮৪৯,৭৮৬ | ২,৩৮৬,১৩০ | ৭,২৩৫,৯১৬ |
| ২ | ত্রিপুরা | ২৭৬ | ৮৩৪,০৯৮ | ৫৪৭,৫৫১ | ১,৩৮১,৬৪৯ |
| ৩ | মেঘালয় | ১৭ | ৫৯১,৫২০ | ৭৬,৪৬৬ | ৬৬৭,৯৮৬ |
| ৪ | আসাম | ২৮ | ২৫৫,৬৪২ | ৯১,৯১৩ | ৩৪৭,৫৫৫ |
| ৫ | বিহার | ৮ | ৩৬,৭৩২ | ... | ৩৬,৭৩২ |
| ৬ | মধ্য প্রদেশ | ৩ | ২১৯,২৯৮ | ... | ২১৯,২৯৮ |
| ৭ | উত্তর প্রদেশ | ১ | ১০,১৬৯ | ... | ১০,১৬৯ |
| | মোট: | ৮২৫ | ৬,৭৯৭,২৪৫ | ৩,১০২,০৬০ | ৯,৮৯৯,৩০৫ |

## সাংকেতিক চিহ্ন

- আর্ন্তজাতিক সীমানা
- রাজ্য সীমানা
- রাজ্যের রাজধানী
- জেলা সীমানা
- জেলা সদর
- রেলপথ
- জাতীয় সড়ক
- অন্যান্য প্রধান সড়ক
- কাঁচা সড়ক

# মুজিবনগর সরকার : বিভিন্ন দপ্তর ও কার্যক্রম



প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বাংলাদেশ সরকারের সদর দপ্তর





১৯৭১ সালে ভারতে অস্থায়ী বাংলাদেশ মিশন
সার্কাস এভিনিউ [কলকাতা] (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ)





বিএসএফ-এর সদর দপ্তর, ২ বি, লর্ড সিনহা রোড



স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

**১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর সরকার) গঠিত হয়। এরপর পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরাসহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সরকারের অস্থায়ী কার্যালয় গড়ে ওঠে। কলকাতা ছিল এই কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্র।**

শেক্সপিয়র সরণি (১৯৭১-এ এই সড়কের নাম ছিল থিয়েটার রোড) : প্রবাসী সরকারের প্রধান দপ্তর ছিল এখানে। এই ঠিকানায় ক্যাবিনেট, প্ল্যানিং, অর্থ, তথ্য ও বেতার, সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, প্রতিরক্ষা, কৃষি এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তর ছিল। এখানে বসতেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, অর্থমন্ত্রী মনসুর আলী, প্রধান সেনাপতি কর্নেল এমএজি ওসমানী।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস রোড : বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের কাজ এখান থেকে পরিচালিত হতো। এর প্রধান দায়িত্বে ছিলেন মতিউর রহমান।

সার্কাস এভিনিউ (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ) : পররাষ্ট্র, আইন এবং তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের দপ্তর এখন থেকে পরিচালিত হতো। পররাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন খন্দকার মোশতাক আহমেদ। আবদুল মান্নান, এমএনএ ছিলেন সংবাদ, তথ্য ও বেতার চলচ্চিত্র বিভাগের দায়িত্বে।

৩/১ ক্যামাক স্ট্রিট : এখানে এপ্রিল মাসে রিলিফের কাজ শুরু হয়। এর প্রধান দায়িত্বে ছিলেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী।

৪৫ প্রিন্সেপ স্ট্রিট (পোস্ট অফিস ভবন) : মে মাসে এখানে রিলিফ অফিস স্থানান্তরিত হয়। যুব অভ্যর্থনা, স্বাস্থ্য, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, ইঞ্জিনিয়ারিং ও লিয়াজোঁ দপ্তর ছিল এখানে। এখানে বসতেন স্বরাষ্ট্র ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রী এ এইচ এম কামারুজ্জামান।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ স্ট্রিট : এখানে বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা দপ্তর অবস্থিত ছিল।

২/বি লর্ড সিনহা রোড : প্রথম বাংলাদেশ সরকারের অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আশ্রয়স্থল ছিল, পরে বিএসএফ-এর সদর দপ্তর ছিল।

১৪৪ লেনিন সরণি : মুক্তিযুদ্ধে যোগদানকারী বাংলাদেশের লেখক, শিল্পী ও কলাকুশলীদের কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র ছিল।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র : ৫৭/৮, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে ২৫ মে স্টুডিয়ো স্থাপিত হয়। এমএনএ আবদুল মান্নানের পরিচালনায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কার্যক্রম শুরু হয়।

২১/এ বালু হাক্কাক লেন : এখানে বাংলাদেশ সরকারের মুখপত্র 'জয় বাংলা' পত্রিকার কার্যালয় ছিল।

# প্রতিরোধ যুদ্ধ

**১৯৭১-এর ৭-১২ জুলাই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার্থে দেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে সশস্ত্র বাহিনীর ১১ জন কর্মকর্তার অধিনায়কত্বে ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সশস্ত্র বাহিনীর সদর দপ্তর স্থাপন করা হয় বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী মুজিবনগরে।**

১ নং সেক্টরঃ মেজর রফিকুল ইসলাম; ২ নং সেক্টরঃ মেজর খালেদ মোশাররফ, তিনি আহত হলে মেজর এ টি এম হায়দার; ৩ নং সেক্টরঃ মেজর কে এম শফিউল্লাহ, তিনি এস ফোর্স অধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করলে মেজর এ এনএম নুরুজ্জামান; ৪ নং সেক্টরঃ মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত; ৫ নং সেক্টরঃ মীর শওকত আলী, ৬ নং সেক্টরঃ উইং কমান্ডার এম কে বাশার; ৭ নং সেক্টরঃ মেজর নাজমুল হক, তিনি শাহাদত বরণ করলে লে. কর্নেল (অব.) কাজী নুরুজ্জামান; ৮ নং সেক্টরঃ মেজর আবু ওসমান চৌধুরী এবং পরে মেজর এম. আবুল মঞ্জুর; ৯ নং সেক্টর : মেজর এম এ জলিল; ১০ নং সেক্টরঃ কর্নেল এমএজি ওসমানীর নেতৃত্বে বিশেষ সেক্টর (নৌ কমান্ড); ১১ নং সেক্টরঃ মেজর আবু তাহের।

৩টি ব্রিগেড গঠন : মুক্তিযুদ্ধের সময় নিম্নলিখিত ৩টি নিয়মিত ব্রিগেড গঠন করা হয়।

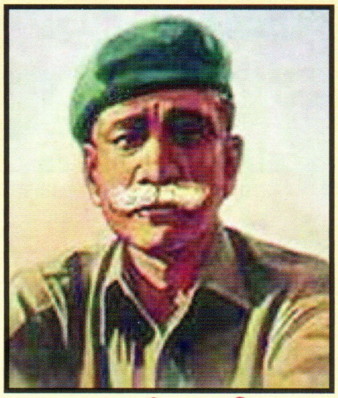
জেড ফোর্স : অধিনায়ক, লে. কর্নেল জিয়াউর রহমান (ব্রিগেডের অধীন ছিল যথাক্রমে ১, ৩ ও ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ২ ফিল্ড ব্যাটারি)। গঠনের তারিখ ও স্থান : ৭ জুলাই, ১৯৭১, তেলঢালা।

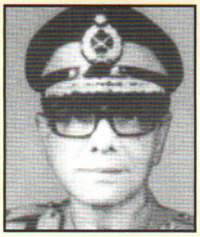
কে ফোর্স : অধিনায়ক, লে. কর্নেল খালেদ মোশাররফ, তিনি আহত হলে মেজর আবু সালেক চৌধুরী (ব্রিগেডের অধীনে ছিল যথাক্রমে ৪, ৯ ও ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, মুজিব ব্যাটারি)। গঠনের তারিখ ও স্থান : ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১, হাজামারা।

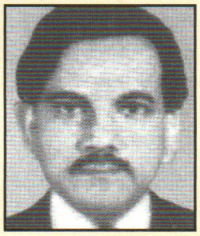
এস ফোর্স : অধিনায়ক, লে. কর্নেল কে.এম. শফিউল্লাহ; (ব্রিগেডের অধীনে ছিল যথাক্রমে ২ ও ১১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট)। গঠনের তারিখ ও স্থান : ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১, হাজামারা।

বিমান বাহিনী : ১৯৭১-এর সেপ্টেম্বর মাসে মুক্তিযোদ্ধা পাইলট ও টেকনিশিয়ান দ্বারা বাংলাদেশ বিমান বাহিনী গঠনের কাজ শুরু হয়। ভারতীয় বিমান বাহিনীর সহযোগিতায় ১টি পুরানো ডিসি-৩ (ডাকোটা বিমান), ১টি ওয়াটার বিমান ও ১টি অ্যালুয়েট-৩ হেলিকপ্টার পাওয়া যায়। ভারতের নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার একটি পরিত্যক্ত রানওয়েতে বিমান সৈনিকদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়। প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হওয়ার পর প্রশিক্ষিত এই বাহিনী পাকিস্তানি বিমান বাহিনীর মোগলহাট, লালমনিরহাট, ঠাকুরগাঁও, চৌগাছা, গোদনাইল, পতেঙ্গা, সুনামগঞ্জ, সিলেট, জামালপুর, নরসিংদীর অবস্থানগুলোর উপর সাফল্যজনক বিমান হামলা চালায় এবং শত্রুর বহু ক্ষতিসাধন করে।

নৌকমান্ডো ও নৌবাহিনী : বাঙালি নাবিক ও মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা নৌকমান্ডো ও নৌবাহিনী সংগঠিত করা হয়। ১০ নং সেক্টরকে নৌ-অঞ্চল হিসেবে সংগঠিত করা হয়। পাকিস্তানিদের দখলকৃত নৌবন্দরগুলোর কার্যকারিতা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে নৌকমান্ডো গঠন করা হয়েছিল।

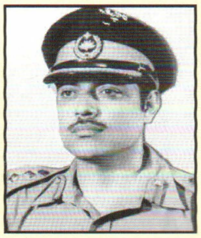

এমএজি ওসমানী
প্রধান সেনাপতি


এম এ রব
চীফ অব স্টাফ


এ কে খন্দকার
উপসেনা প্রধান ও বিমান বাহিনী প্রধান


কে এম শফিউল্লাহ
এস ফোর্স (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর)


জিয়াউর রহমান
জেড ফোর্স

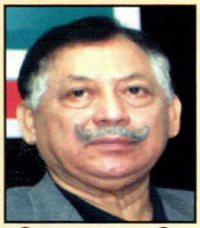

খালেদ মোশাররফ
কে ফোর্স (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর)


এ এন এম নূরুজ্জামান
সেক্টর-৩ (অক্টোবর-ডিসেম্বর)

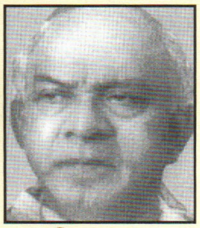

রফিকুল ইসলাম
সেক্টর-১ (জানুয়ারি-ডিসেম্বর)

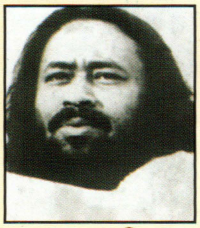

সি আর দত্ত
সেক্টর-৪


এম কে বাসার
সেক্টর-৬

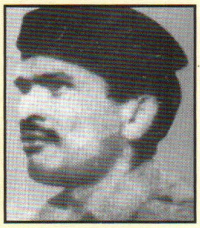

মীর শওকত আলী
সেক্টর-৫

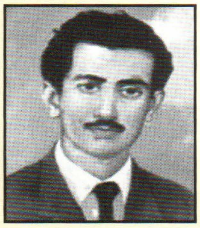

আবু ওসমান চৌধুরী
সেক্টর-৮ (এপ্রিল-আগস্ট)


কাজী নুরুজ্জামান
সেক্টর-৭ (আগস্ট-ডিসেম্বর)

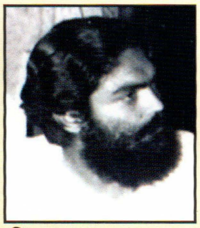

এম এ জলীল
সেক্টর-৯

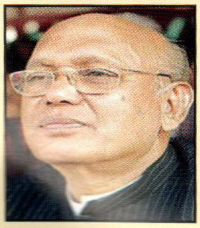

এম এ মনজুর
সেক্টর-৮ (আগস্ট-ডিসেম্বর)

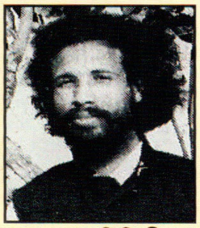

এম এ তাহের
সেক্টর-১১ (এপ্রিল-নভেম্বর)


শেখ ফজলুল হক মনি
সংগঠক মুজিব বাহিনী পূর্ব অঞ্চল


আবদুর রাজ্জাক
সংগঠক মুজিব বাহিনী উত্তর পশ্চিম অঞ্চল


সিরাজুল আলম খান
সংগঠক মুজিব বাহিনী উত্তর অঞ্চল


তোফায়েল আহমদ
সংগঠক মুজিব বাহিনী পশ্চিম-দক্ষিণ অঞ্চল


কাদের সিদ্দিকী
কাদের বাহিনী

২৭ মে ভারতের পলাশীতে ৮ জন নৌবাহিনীর নাবিকসহ ৩৫৭ জন নিয়ে এই বাহিনী গঠন করা হয়। পরবর্তীতে এই বাহিনীর সদস্য-সংখ্যা দাঁড়ায় ৬০০ জনে।

১৯৭১-এর আগস্ট মাসে অপারেশন জ্যাকপটের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় নৌকমান্ডোরা শত্রুর বহু জাহাজ ক্ষতিসাধন করে। চট্টগ্রামে নৌ হামলা, হিরণ পয়েন্টে মাইন আক্রমণ, চালনা বন্দর আক্রমণ, চাঁদপুর ও গোয়ালন্দ বন্দর আক্রমণ ইত্যাদি অপারেশনে শত্রুর অনেক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়।

নারী মুক্তিযোদ্ধা : মহান মুক্তিযুদ্ধে এ দেশের নারীরা শুধুমাত্র সেবা ও প্রেরণার যোগান দেননি। তারা সম্মুখ সমরে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। এই জনযুদ্ধে পুরুষদের পাশাপাশি থেকে নারীরাও সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। ২জন নারী মুক্তিযোদ্ধা বীরপ্রতীক খেতাবে ভূষিত হয়েছেন।

বিএসএফ গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনার লক্ষ্যে ৪ জন যুব নেতার যৌথ নেতৃত্বে বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স (BLF) নামে একটি পৃথক বাহিনী গড়ে তোলা হয়। পরবর্তীকালে এই বাহিনী মুজিব বাহিনী নামে অভিহিত হয়। প্রাথমিকভাবে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ের নেতারা এই বাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃত্বে ছিলেন। বিএলএফ বাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল ভারতের তান্দুয়া ও জাফলং-এ। এই দুটো প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রায় ৪,০০০ জন ছাত্র ও যুবককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ১০টি সেক্টর এলাকায় সমন্বিতভাবে তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এই বাহিনীর সমন্বয়কারী হিসেবে ছিলেন পূর্ব অঞ্চলে শেখ ফজলুল হক মনি, উত্তর অঞ্চলে সিরাজুল আলম খান, পশ্চিম অঞ্চলে আবদুর রাজ্জাক, দক্ষিণ অঞ্চলে তোফায়েল আহমদ।

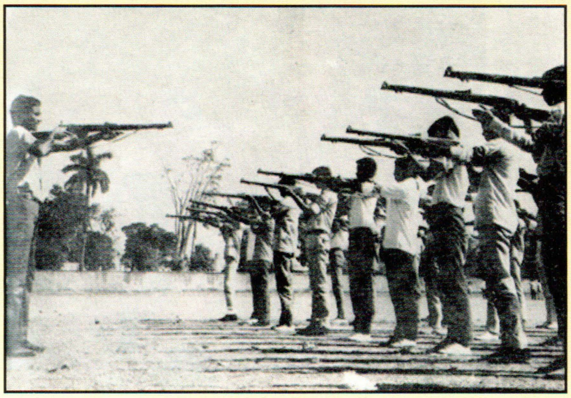
টাঙ্গাইল মুক্তিবাহিনী : অবরুদ্ধ বাংলাদেশে টাঙ্গাইল জেলায় কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে সংগঠিত হয় একটি গেরিলা বাহিনী। স্থানীয় ছাত্র-জনতার সহযোগিতায় তারা যুদ্ধে সক্রিয় ছিল।

মোহাম্মদ ফরহাদ ও চৌধুরী হারুনুর রশীদ-এর নেতৃত্বে ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের একটি গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলা হয়।

বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্ত অঞ্চলে ভারতের ৪টি রাজ্যে (পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম ও মেঘালয়) মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের জন্য গড়ে ওঠে ৮১৫টি প্রতিরোধ শিবির।

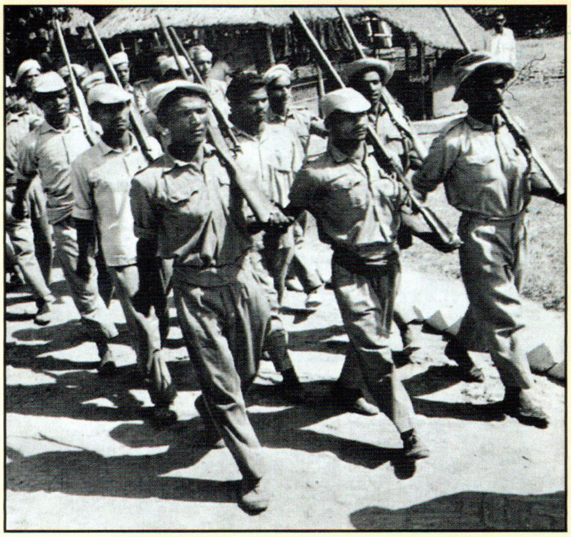
ক্র্যাক প্লাটুন, ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর গেরিলা দল : ঢাকা শহর ও তার আশপাশে চোরাগুপ্তা ও ক্ষুদ্র আক্রমণের লক্ষ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কয়েকটি গেরিলা দল গঠন করা হয়। যেগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল ক্র্যাক প্লাটুন, ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর গেরিলা দল। ২ নং সেক্টরের মেজর হায়দারের নেতৃত্বে এই দলটি গঠিত হয়। তাদের উল্লেখযোগ্য অপারেশন ছিল হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে গ্রেনেড আক্রমণ, ঢাকার ৫টি ১১ কেভি পাওয়ার স্টেশন ধ্বংস, যাত্রাবাড়ী ব্রিজে এক্সপ্লোসিভ চার্জ, হামিদুল হক চৌধুরীর প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিতে এক্সপ্লোসিভ চার্জ, বিডিআর গেট/ধানমন্ডি আক্রমণ, নিউ মার্কেটের কাছে পেট্রোল পাম্পসহ বিভিন্ন স্থানে গ্রেনেড আক্রমণ, আর্মি রিক্রুটিং অফিস আক্রমণ ইত্যাদি। এই আক্রমণগুলোর সংবাদ বিদেশি প্রচারমাধ্যমে ফলাও করে প্রচারিত হয়েছিল এবং মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে বিশ্বজনমত সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল।

২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাংলাদেশের জনগণের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায় এবং গণহত্যা শুরু করে। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী, ইপিআর, আনসার, পুলিশ, মুজাহিদ, ছাত্র, শিক্ষক এবং সর্বস্তরের মানুষ তাদের যার যা ছিল তা নিয়ে তাদের প্রতিহত করা শুরু করে। ঐতিহাসিক তেলিয়াপাড়া সম্মেলনের পর পাকিস্তানি হানাদারের আক্রমণের বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধকৌশল স্থির করা হয়। সক্রিয় যুদ্ধে অংশ নেওয়া, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের জন্য ভারতের বেশ কিছু স্থানে গড়ে তোলা হয় মুক্তিবাহিনী শিবির।



প্রশিক্ষণরত মুক্তিযোদ্ধা

**বাংলাদেশ সেনা সদর দপ্তর :** কলকাতার শেক্সপিয়ার সরণিতে বাংলাদেশ সরকারের প্রধান দপ্তর ছিল এই অফিস। কর্নেল এমএমজি ওসমানী ছিলেন প্রধান সেনাপতি। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের নির্দেশক্রমে প্রধান সেনাপতির নেতৃত্বে যুদ্ধ ও প্রশিক্ষণবিষয়ক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়। ১৯৭১-এর ১১ জুলাই মুজিবনগরে উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধাঞ্চল ও যুদ্ধকৌশল সম্বন্ধে বিস্তারিত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাংলাদেশের যুদ্ধাঞ্চলকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়। সেক্টরগুলোর গঠনের তারিখ ছিল ১৯৭১-এর ১২ জুলাই।



মুক্তিযোদ্ধাদের মার্চ পাস্ট

**মুক্তিযুদ্ধকালীন সেক্টর সদর দপ্তর (১১টি) :** ১ নং সেক্টরের সদর দপ্তর–হরিণা; ২ নং সেক্টরের সদর দপ্তর–মেলাঘর; ৩ নং সেক্টরের সদর দপ্তর–মনতলা; ৪ নং সেক্টরের সদর দপ্তর–প্রথমে করিমগঞ্জ, পরে মাছিমপুর; ৫নং সেক্টরের সদর দপ্তর–বাঁশতলা; ৬ নং সেক্টরের সদর দপ্তর–বুড়িমারী; ৭ নং সেক্টরের সদর দপ্তর–তরঙ্গপুর; ৮ নং সেক্টরের সদর দপ্তর–কল্যাণী; ৯ নং সেক্টরের সদর দপ্তর–প্রথমে হাসনাবাদ ও পরে টাকী; ১০ নং সেক্টরের সদর দপ্তর–কলকাতা; এবং ১১ নং সেক্টরের সদর দপ্তর–মহেন্দ্রগঞ্জ।

**যুবশিবির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (১১০/১১টি) :** যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তরুণ ও যুবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো।

**প্রধান ট্রেনিং ক্যাম্পসমূহ (২টি) :** প্রধান ট্রেনিং ক্যাম্প দুটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম রাজ্যে অবস্থিত ছিল।



মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষণরত নারীদের মার্চ পাস্ট

**বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স (মুজিব বাহিনী) :** ৪টি সেক্টরে বিভক্ত এই ফোর্সের অফিস ছিল ব্যারাকপুর, শিলিগুড়ি, আগরতলা মেঘালয়ে। কেন্দ্রীয় কমান্ডার ছিলেন তোফায়েল আহমদ, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও শেখ ফজলুল হক মনি।

**বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা মহিলা ক্যাম্প :** মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে গোবরা ক্যাম্পে বেগম সাজেদা চৌধুরীর পরিচালনায় মহিলা মুক্তিযোদ্ধাদের নার্সিং ও অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো।

**মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের (রাশিয়া) ভূমিকা :** প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগোর্নি মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে মার্চ মাসেই গণহত্যা বন্ধ করতে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্টের কাছে দাবি জানান। ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তির অধীনে বাংলাদেশকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার আশ্বাস পেয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রেই গ্রোমিকো জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের পক্ষে তিনবার ভোট প্রদান করেছিলেন।



নিকোলাই পদগোর্নি



আন্দ্রেই গ্রোমিকো

# শরণার্থী শিবির



শরণার্থীদের উদ্দেশ্যে ভাষণদানরত শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী



শরণার্থী শিবিরে মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি



প্রাণভয়ে ছুটছে হাজার হাজার মানুষ



শরণার্থী শিবির

১৯৭১-এর ২৬ মার্চ রাতের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সারাদেশে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। পাকিস্তানি সেনাদের অত্যাচারে নিরপরাধ মানুষ শহর ছেড়ে গ্রামে, গ্রাম ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে সীমানা পেরিয়ে ভারতের মাটিতে আশ্রয় নিতে শুরু করে।

৩১ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থান ও প্রতিরোধ তথা মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন ও সহমর্মিতা ঘোষণা করেন।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ দুর্গত বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আবেদন জানান। ১৫-১৬ মে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসাম রাজ্যে আশ্রয়প্রার্থী লক্ষ লক্ষ বাঙালি শরণার্থীর দুঃখ-দুর্দশা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। ভারতে ও বিশ্ববাসীর কাছে নিরাপরাধ মানুষের উপর পাকিস্তানি সামরিক জান্তার হত্যাযজ্ঞের চিত্র তুলে ধরেন। ১৯৭১-এর ২৪ মে ভারতীয় লোকসভায় বাংলাদেশের পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন—

"এত অল্প সময়ে এই বিপুল জনসংখ্যার দেশত্যাগ (migration) ইতিহাসে নজিরবিহীন। গত ৮ সপ্তাহে প্রায় ৩৫ লক্ষ মানুষ বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। এই জনসমষ্টির মধ্যে রয়েছে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান; প্রতিটি ধর্মের বিভিন্ন সামাজিক স্তর ও নানা বয়সের মানুষ। প্রচলিত অর্থে এদের 'উদ্বাস্তু' বলা চলে না, যদিও দেশভাগের সময় থেকেই আমরা এই উদ্বাস্তু কথাটির সাথে পরিচিত। প্রকৃত অর্থে এরা হলেন যুদ্ধের শিকার, যারা সামরিক সন্ত্রাস থেকে মুক্তি পেতে সীমানা পেরিয়ে আমাদের দেশে আশ্রয় নিয়েছে।"

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহেই ভারতে আশ্রয়প্রাপ্ত শরণার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০ লক্ষাধিক। ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়া মহাদেশের অনেক দেশ, বিশেষ করে রাশিয়া ও ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের ওপারে আশ্রয়প্রাপ্ত বিশালসংখ্যক শরণার্থীদের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে। ২৮ জুলাই 'ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটি ইমারজেন্সি মিশন (ভারতে আশ্রয়প্রাপ্ত বাংলাদেশ শরণার্থী সংক্রান্ত)'-এর চেয়ারম্যান মি. এনজিয়ার বিড্‌ল্‌ ডিউক মার্কিন সরকারের নিকট প্রদত্ত তার রিপোর্টের এক অংশে উল্লেখ করেন—

"যদিও পাকিস্তান সেনাবাহিনী হাজার হাজার বাঙালি মুসলমানকে নির্বিচারে হত্যা করেছে, তথাপি হিন্দু জনসাধারণই ছিল এই আক্রমণের মূল লক্ষ্য। হিন্দু, ভারত ও তাদের দালালরাই পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য দায়ী বলে সামরিক জান্তা মনে করে। যে সকল মুসলমান হিন্দুদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিল, পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের একাংশকেও বাধ্য করেছিল হিন্দুদের বাড়িঘর ও সম্পত্তি পোড়ানো ও লুট করতে, এ কাজ না করলে তাদেরও হত্যা করার হুমকি দিয়েছিল।"

১৩ আগস্ট মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সফর করেন এবং শরণার্থী-জনগণের দুর্দশা দেখে বলেন, 'It is the greatest human tragedy of our time.'

পাকিস্তানি সামরিক জান্তার নৃশংস অত্যাচারে অবরুদ্ধ বাংলাদেশ থেকে নভেম্বর মাসের শেষে ভারতে আশ্রিত শরণার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১ কোটি। ৩০ লক্ষ শহিদের আত্মত্যাগে ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়। শরণার্থীরাও স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে ফিরতে শুরু করেন।

# ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও জেলাভিত্তিক শরণার্থী পরিসংখ্যান

## ১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত

| ক্রমিক নম্বর | রাজ্যের নাম | শিবির সংখ্যা | ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত শরণার্থীর সংখ্যা | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | শিবিরের মধ্যে | শিবিরের বাইরে | মোট |
| ১. | পশ্চিমবঙ্গ | ৪৯২ | ৪৮,৪৯,৭৮৬ | ২৩,৮৬,১৩০ | ৭২,৩৫,৯১৬ |
| ২. | ত্রিপুরা | ২৭৬ | ৮,৩৪,০৯৮ | ৫,৪৭,০৯৮ | ১৩,৮১,৬৪৯ |
| ৩. | মেঘালয় | ১৭ | ৫,৯১,৫২০ | ৭৬,৪৬৬ | ৬,৬৭,৯৮৬ |
| ৪. | আসাম | ২৮ | ২,৫৫,৬৪২ | ৯১,৯১৩ | ৩,৪৭,৫৫৫ |
| ৫. | বিহার | ৮ | ৩৬,৭৩২ | - | ৩৬,৭৩২ |
| ৬. | মধ্যপ্রদেশ | ৩ | ২,১৯,২৯৮ | - | ২,১৯,২৯৮ |
| ৭. | উত্তরপ্রদেশ | ১ | ১০,১৬৯ | - | ১০,১৬৯ |
| | **মোট** | **৮২৫** | **৬৭,৯৭,২৪৫** | **৩১,০২,০৬০** | **৯৮,৯৯,৩০৫** |

## গণহত্যা ও বধ্যভূমি

১৯৭১-এ বাংলাদেশের শহরে, গ্রামে-গঞ্জে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। দেশের আনাচে-কানাচে রয়েছে অসংখ্য বধ্যভূমি। এসব বধ্যভূমির মধ্যে খুব কমসংখ্যক বধ্যভূমি সংরক্ষণ করা হয়েছে। আমাদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এই দেশের কিছু মানুষ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহযোগী হিসেবে কাজ করে। তারা নিজের দেশের মানুষকে হত্যা করতে পাক হানাদারদের সহযোগিতা করে। নিম্নলিখিত বাহিনী মাতৃভূমির বিরুদ্ধে শত্রুর সাথে যোগ দেয় :

রাজাকার বাহিনী : ১৯৭১ সালের মে মাসে জামায়াত নেতা মওলানা একেএম ইউসুফের নেতৃত্বে ৯৬ জন জামায়াত কর্মী নিয়ে খুলনার আনসার ক্যাম্পে একটি বাহিনী গঠিত হয়, যার নামকরণ করা হয় রাজাকার। জেনারেল টিক্কা খান ১৯৭১-এর জুন মাসে পূর্ব পাকিস্তান রাজাকার অর্ডিন্যান্স জারি করে। এই বাহিনী পাকিস্তানের স্বীকৃতি লাভ করে। রাজাকার বাহিনীর নেতৃত্ব ইসলামী ছাত্র সংঘের নেতাদের দেওয়া হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে এই বাহিনীর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন মাঠ এবং মোহাম্মদপুরের ফিজিক্যাল ট্রেনিং মাঠে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। প্রতিটি রাজাকারকে ৩০৩ রাইফেল ও অধিনায়কদের স্টেনগান সরবরাহ করা হয়েছিল। এই বাহিনী গণহত্যা, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, নারী নির্যাতন ইত্যাদি জঘন্য অপরাধমূলক তৎপরতায় লিপ্ত ছিল।

শান্তি কমিটি : অধ্যাপক গোলাম আজম ও হামিদুল হক চৌধুরী ১৯৭১-এর ৬ এপ্রিল টিক্কা খানকে নাগরিক শান্তি কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেন। ১৯৭১-এর ৯ এপ্রিল ১৪০ জন সদস্য নিয়ে ঢাকায় নাগরিক শান্তি কমিটি–গঠন করা হয় এবং তাদের কার্যকলাপ শুরু হয়। ১৯৭১-এর ১৪ এপ্রিল এই কমিটির নাম শান্তি কমিটি রাখা হয় এবং দেশের বিভিন্ন জেলা, মহকুমা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে তাদের কমিটি গঠন করা হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সর্বক্ষেত্রে সহযোগিতা ও সাহায্য প্রদান, রাজাকার-সদস্য সংগ্রহ, নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ করা এই কমিটির দায়িত্ব ছিল। এই কমিটি গণহত্যা, নির্যাতন ও মানবতাবিরোধী সমস্ত কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ছিল।

আল-বদর/আল-শামস্ : জামায়াত ও তাদের ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের দ্বারা এই সংগঠন গঠিত হয়। তারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সকল প্রকার সহযোগিতা করত। গণহত্যা ও নির্যাতন ছিল তাদের প্রধান কর্মকাণ্ড। বুদ্ধিজীবী হত্যা তারাই সংঘটিত করেছিল।




একাত্তরের শহিদ বুদ্ধিজীবী ১৯ জন



ঢাকার অদূরে রায়েরবাজারের বধ্যভূমি। এই স্থানে পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর অন্যতম সহযোগী আল-বদর সদস্যরা নেতৃস্থানীয় অধ্যাপক, সাহিত্যিক, শিল্পী, ডাক্তার, সাংবাদিক এবং বুদ্ধিজীবীদের ধরে এনে নৃশংসভাবে হত্যা করত। ঢাকার মুক্তির পর নিহতদের শোকাহত পরিবার-পরিজন বধ্যভূমিতে লাশ খুঁজছেন।